# বাংলাদেশ

**আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিবেদন ২০০৭**
**ব্যুরো অব ডেমোক্রেসি, হিউম্যান রাইটস এন্ড লেবার কর্তৃক প্রকাশিত।**

বাংলাদেশের সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তবে কোন ব্যক্তি আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে তার নিজ পছন্দ অনুসারে যে কোন ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, পালন ও প্রচার করতে পারবেন -এই মর্মে শাসনতন্ত্রে বিধান রাখা হয়েছে। এখানে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অথবা এদের কোন ক্ষুদ্র অংশের নিজ নিজ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা করার অধিকার রয়েছে। সরকার প্রকাশ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সমর্থন করলেও ধর্ম এবং জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আঘাত একটা সমস্যা হিসেবে এখনও বিরাজমান রয়েছে। আহমদিয়া সম্প্রদায়কে অ-মুসলিম হিসেবে ঘোষণা করার দাবি এবং তাদের ওপর উৎপীড়নের ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত হয়েছে। তবে সরকার আহমদিয়া সম্প্রদায়ের লোক ও তাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। রাজনীতির ওপর ধর্ম যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং সরকার তাদের রাজনৈতিক মিত্র দলগুলো ও সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের ইসলামি চেতনার ওপর সংবেদনশীল ছিল।

প্রতিবেদনের সময়কালে ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি সরকারের শ্রদ্ধাবোধের স্তরে কোন পরিবর্তন হয়নি। দেশের নাগরিকরা সাধারণত স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করেছে, তবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারি কর্মকর্তা ও পুলিশ প্রায়শই অকার্যকর ছিল এবং কোন কোন সময় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর উৎপীড়ন ও হামলার ক্ষেত্রে ধীরগতিতে তাদেরকে সাহায্য করেছে। সরকার এবং সুশীল সমাজের অনেক নেতারা বলেছেন যে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর উৎপীড়নের পেছনে সাধারণত রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক প্রেষণা ছিল এবং এসবের কারণ শুধুমাত্র ধর্মের প্রতি আরোপ করা যাবে না।

এই প্রতিবেদনে উল্লিখিত সময়ে ধর্মীয় বিশ্বাস ও চর্চার ওপর ভিত্তি করে সামাজিক নির্যাতন ও বৈষম্যের খবর পাওয়া গেছে। হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধরা বৈষম্যের শিকার হয়েছে এবং কোন কোন সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে। আহমদিয়াদেরকে অ-মুসলিম ঘোষণার দাবির সাথে সাথে তাদের ওপর উৎপীড়নও অব্যাহত ছিল।

২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্যজোটসহ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বাধীন জোট জাতীয় সরকার ২০০৭ সালের জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতির লক্ষ্যে সংবিধান সম্মত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতার্পণের জন্য পদত্যাগ করে। কিন্তু ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মদ এক তরফা নির্বাচন ও সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং এর পরের দিন একটি নতুন, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শপথ গ্রহণ করে। নতুন সরকারের দশজন উপদেষ্টা বা মন্ত্রীর মধ্যে একজন খ্রিস্টান। অক্টোবর ২০০৬ সালে বিলুপ্ত ৩০০ আসনের জাতীয় সংসদে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ৮টি আসন ছিল।

২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনের প্রচারণার সময় দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যকার চরম শত্রুতার দরুণ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অসংখ্য উল্লেখযোগ্য সহিংসতার ঘটনা ঘটেছিল। এই প্রতিবেদনের

সময়কালের শেষ পর্যন্ত অবশ্য রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সংশ্লিষ্টতায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর কোন উল্লেখযোগ্য সহিংস ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

মানবাধিকার উন্নয়নের সামগ্রিক নীতির অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশ সরকারের সাথে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে আলোচনা করে। কর্মকর্তাদের সাথে সভা ও গণ-বিবৃতির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের কর্মকর্তারা সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য সরকারকে উৎসাহিত করেছে। প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কাজগুলোর প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করেছে এবং সকল নাগরিকের জন্য যথাযথ পদ্ধতি নিশ্চিত করার জন্য সরকারের আহবান জানিয়েছে। ২০০৬ সালের গোড়ার দিকে আগামী নির্বাচনী প্রচারণার সময় সহিংস ঘটনাবলি প্রতিরোধ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস উভয় দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছিল এবং দূতাবাসের উদ্বেগের বিষয়টি তাদেরকে গুরুত্বের সাথে জানানোর জন্য ও ভবিষ্যৎ সমস্যার ক্ষেত্রে যোগাযোগের লাইন শক্তিশালী করার জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎ করেছেন। ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে সেনাবাহিনীর হাতে একজন গারো নেতার মৃত্যুর পর গারো সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে দেখা করার জন্য তিনি মধুপুরের রোমান ক্যাথলিক মিশন পরিদর্শন করেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকার দ্বিতীয় বছরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের একজন স্বনামধন্য মুসলিম ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে বাংলাদেশ সফরের ব্যবস্থা করে। তিনি পবিত্র কোরআনের যেসব আয়াত সহিষ্ণুতা ও নারী-পুরুষ ন্যায্যতার বিষয়গুলো সমর্থন করে, সেগুলো ব্যাখ্যা করে শ্রোতাদের সম্মুখে তুলে ধরেন।

## অনুচ্ছেদ-১: ধর্মীয় জনসংখ্যা তত্ত্ব

এই দেশের আয়তন ৫৫,১২৬ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ১৫ কোটি। ৮৮ শতাংশ লোক সুন্নি মুসলমান। প্রায় ১০% লোক হিন্দু, বাকিরা প্রধানত খ্রিস্টান (অধিকাংশ রোমান ক্যাথলিক) এবং তেরাভাদা-হিনায়েন বৌদ্ধ। উপ-জাতীয় ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রায় একই রকম এবং তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে কেন্দ্রীভূত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় আদিবাসী অবাঙ্গালি জনগণের মধ্যেই অধিকাংশ বৌদ্ধ দেখা যায়। বাঙ্গালি ও আদিবাসী সংখ্যালঘু খ্রিস্টান দেশব্যাপী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় - যেমন বরিশাল শহর, বরিশালের গৌরনদী, গোপালগঞ্জের বানিয়ারচর, ঢাকার মনিপুরী পাড়া, ঢাকার মহাখালীতে খ্রিস্টান পাড়া, গাজীপুরের নাগরীতে। এছাড়াও অল্প সংখ্যক শিয়া মুসলমান, শিখ, বাহাই, অ্যানিমিস্ট ও আহমদিয়া জনসাধারণ রয়েছেন। এই ধরনের প্রতিটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোকসংখ্যা আনুমানিক কয়েক হাজার থেকে লাখ পর্যন্ত। এখানে কোন দেশীয় ইহুদি সম্প্রদায়, এমনকি উল্লেখ করার মত অভিবাসী ইহুদিও নেই।

নাগরিকদের সাম্প্রদায়িক পরিচিতির ক্ষেত্রে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় - এমনকি যারা সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন প্রার্থনায় বা অন্যান্য ধর্মীয় কর্মে অংশগ্রহণ করেন না তাদের ক্ষেত্রেও। ২০০৩ সালের শেষের দিকের একটি জাতীয় জরিপ এটা নিশ্চিত করেছে যে, আত্ম-পরিচয়ের ক্ষেত্রে একজন নাগরিকের জন্য ধর্মই হচ্ছে প্রথম পছন্দ; নাস্তিকতা এখানে একেবারেই বিরল।

এদেশে বসবাসরত বিদেশী নাগরিক হিসেবে শ্রেণীকৃত অধিকাংশ ব্যক্তিই হলেন ত্যাগকারী প্রত্যাবর্তিত বাংলাদেশী লোক। এদেশে প্রায় ৩০,০০০ রোহিঙ্গা শরণার্থী রয়েছে - যারা ইসলাম ধর্ম পালন করেন।

খ্রিস্টান মিশনারীদের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। এদেশে কিছু ধর্ম-ভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) কাজ করে।

## অনুচ্ছেদ-২: ধর্মীয় স্বাধীনতার অবস্থা

### আইন/ নীতিগত কাঠামো

বাংলাদেশের সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তবে আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে কোন ব্যক্তি তার নিজ পছন্দ অনুসারে যে কোন ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, পালন ও প্রচার করতে পারবে - এই মর্মে সংবিধানে বিধান রাখা হয়েছে। সরকার প্রকাশ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সমর্থন করলেও ধর্ম এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আঘাত একটা সমস্যা হিসেবে এখনও বিরাজমান রয়েছে।

সংবিধানে ব্যক্তির পছন্দমত ধর্ম প্রচারের অধিকার প্রদান করা হলেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও সম্প্রদায়গুলো প্রায়ই ইসলাম থেকে অন্য ধর্মে ধর্মান্তর প্রচেষ্টায় আপত্তি করে থাকে।

সাধারণভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও আদালত ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করে থাকে। সরকার ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী পরিচালনা করে থাকে এবং ইসলাম ধর্মীয় উৎসবের দিনগুলো ঘোষণা করে থাকে, কিন্তু খুতবার বিষয়বস্তু কি হবে তা নির্ধারণ করে না, ইমাম নির্বাচন করে না বা তাদের বেতনভাতাও প্রদান করে না এবং মাদরাসাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়গুলো পরিবীক্ষণ করে না।

শরিয়ত (ইসলামি আইন) আনুষ্ঠানিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়নি এবং তা অ-মুসলিমদের ওপর আরোপ করা হয়নি; কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের দেওয়ানি বিষয়ে এ আইন শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ভূমির মালিকানার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন দেওয়ানি বিষয়ে এবং পারিবারিক কলহ দূরীকরণে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। উভয় পক্ষ রাজি থাকলে বিবাদ নিরসনের জন্য মধ্যস্থতাকারী শরিয়তের মূলনীতির ওপর নির্ভর করতে পারেন। এছাড়াও মুসলিম পারিবারিক আইন শিথিলভাবে শরিয়তের ওপর নির্ভরশীল।

২০০১ সালে হাইকোর্ট শরিয়তের ওপর নির্ভর করে আইনি মতামত প্রদান বা ফতোয়াকে বেআইনি ঘোষণা করেছে। সব ধরনের ফতোয়াকে বেআইনি ঘোষণার মাধ্যমে হাইকোর্ট ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক স্থানীয় জনসাধারণের ওপর জোরপূর্বক আরোপিত বিচার বহির্ভূত শাস্তি এবং বিধিনিষেধ বন্ধ করতে চেয়েছে। হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পুরোপুরিভাবে ধর্মীয় বিষয়ের ঘোষণা- যথা: উৎসবের দিনের ঘোষণা, বিবাহ বা তালাকের ধর্মীয় বৈধতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞার কয়েক সপ্তাহ পরে একদল আলেমের আপিলের ভিত্তিতে আপিল বিভাগ হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করে - এই মর্মে যে, আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ফতোয়া বন্ধ সংক্রান্ত হাইকোর্টের আদেশ বাস্তবায়ন করা যাবে না। এটা স্পষ্ট নয় - কখন এই আপিল বিবেচনায় আসবে।

যেখানে ইসলামি প্রথায় বলা আছে, শুধুমাত্র ইসলামি আইনের বিশেষজ্ঞ মুফতী বা পণ্ডিতই ফতোয়া দেবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত, সেখানে গ্রাম্য মৌলবিরাও কখনও কখনও কোন ব্যক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা

করে থাকে এবং এই ঘোষণাকে ফতোয়া বলে অভিহিত করে। কোন কোন সময় এই ঘোষণার ফলে প্রায়শই নারীদের বিরুদ্ধে অনুমানভিত্তিক নৈতিক স্খলনের কারণে বিচার বহির্ভূত এই শাস্তি প্রদান করা হয়।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিজ নিজ ধর্মের ওপর ভিত্তি করে বিবাহ, তালাক ও দত্তক গ্রহণ সংক্রান্ত পারিবারিক আইনের কিছুটা তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব পারিবারিক আইন রয়েছে। মুসলমান পুরুষরা চারটা পর্যন্ত বিবাহ করতে পারে; তবে এক্ষেত্রে অতিরিক্ত স্ত্রী গ্রহণের জন্য তাকে প্রথম স্ত্রীর লিখিত অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। অপরদিকে, খ্রিস্টান পুরুষরা মাত্র একজন স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারে। হিন্দু আইনে অসীমিত বহুবিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে; তবে তালাক বা আইনগত বিচ্ছেদের কোন বিধান নেই। হিন্দু বিধবারা আইনগতভাবে পুনঃবিবাহ করতে পারেন। বিভিন্ন ধর্ম গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে কোন আইনগত প্রতিবন্ধকতা নেই।

ধর্ম রাজনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং সরকার এর রাজনৈতিক মিত্র জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের ইসলাম ধর্মীয় সচেতনতার বিষয়ে সংবেদনশীল ছিল।

২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে আওয়ামী লীগ তার বহু সংখ্যালঘু ও উদার সমর্থকদের বিরাগভাজন হয় - যখন তারা খেলাফত মজলিসের সাথে নির্বাচনী চুক্তি স্বাক্ষর করে। খেলাফত মজলিস সহিংস ইসলামি জঙ্গীদের সাথে সংযোগ আছে এমন একটি খণ্ডক্ষুদ্র ইসলামি সংগঠন। চুক্তিতে এ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় যে, ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে তারা কিছু ফতোয়ার স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং নবী মুহাম্মদকে (স.) শেষ নবী হিসেবে ঘোষণা দিবে যা আহমদিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ। আহমদিয়া ও উদার বাংলাদেশী নাগরিকরা এই চুক্তিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের কৌশল হিসেবে সমালোচনা করেন এবং একে দলের মূলনীতির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করেন। এই সমালোচনার পরে এবং দলের প্রবীণ নেতাদের প্রকাশ্য বিদ্রোহের ফলে আওয়ামী লীগ জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরে চুপিসারে এই চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ায়।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয় তিনটি ধরনের তহবিল পরিচালনা করে থাকে: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট ও বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট। সরকারের মতানুসারে খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে সরকারের সম্পৃক্ততা চায় না এবং এ কারণে এই সম্প্রদায়ের জন্য অনুরূপ কোন সংস্থা/ সংগঠন নেই। তবে সরকার খ্রিস্টান নেতাদেরকে বলেছে যে, সত্বর খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্য খ্রিস্টান কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই রিপোর্ট তৈরির শেষ নাগাদ হিসাবে, হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট-এ প্রায় ১.৭ মিলিয়ন ডলার সঞ্চয় ছিল (১২ কোটি টাকা)। এই বছরে এই ট্রাস্ট সরকারের কাছ থেকে প্রায় ৩০ হাজার ডলার (২০ লক্ষ টাকা) পেয়েছে। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ট্রাস্ট এর অর্থ মন্দির মেরামত, শেষকৃত্যের বৈদ্যুতিক চুলা সংস্কার এবং দুঃস্থ হিন্দু পরিবারের চিকিৎসা খরচ নির্বাহের জন্য ব্যয় করেছে। এ ছাড়াও প্রায় ৩০ হাজার ডলার (২০ লক্ষ টাকা) বার্ষিক পূজা উদ্‌যাপনের জন্য ব্যয় করা হয়েছে।

১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্টেরও এই রিপোর্ট প্রস্তুতের শেষের দিকে ৪২৫ হাজার ডলার (৩ কোটি টাকা) জমা ছিল। এই ট্রাস্ট এর অর্থ বৌদ্ধ বিহার মেরামত, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রশিক্ষণ দান এবং

বৌদ্ধ পূর্ণিমা উদ্‌যাপনের জন্য ব্যবহার করেছে। কিভাবে এই অর্থ ভাগ ও বণ্টন হয়েছে এ বিষয়ে কোন গণ-সমালোচনা নেই।

মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসব ও পবিত্র দিনগুলোকে জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়। বাংলাদেশ খ্রিস্টান সমিতি ইস্টার ডে'কে জাতীয় ছুটি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য লবি করে ব্যর্থ হয়।

ধর্মীয় সংগঠনগুলোকে সরকারের সাথে নিবন্ধিত হওয়ার প্রয়োজন হয়না; তবে সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিদেশী আর্থিক সহায়তা লাভ করে এমন সকল বেসরকারি সংস্থা ও ধর্মীয় সংগঠনসমূহকে সরকারের এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোতে নিবন্ধিত হতে হয়। বেসরকারি সংস্থাগুলোর নিবন্ধন বাতিল করার আইনগত ক্ষমতা সরকারের রয়েছে, যদি এই মর্মে সন্দেহ হয় যে, সংস্থাগুলো তাদের আইনগত ও আর্থিক বাধ্যবাধকতা ভঙ্গ করেছে এবং সরকার এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নিতে পারে, যেমন, বিদেশী তহবিল আনা বন্ধ করে দেওয়া, কার্যক্রম সীমিত করা। এই রিপোর্ট প্রস্তুতের সময়কালে সরকার সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের সাথে যোগসূত্রের অভিযোগে রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ নামক একটি বেসরকারি সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করে দেয়। অতীতে অনেক বেসরকারি সংস্থার সদস্যরা ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য বিদেশ ভ্রমণ করতে চাইলে তাদের ওপর আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোক ও গোয়েন্দা কর্মকর্তারা চাপ প্রয়োগ করে তাদেরকে দেশে থাকতে বাধ্য করেন; কিন্তু এই প্রতিবেদনে বিবেচিত সময়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি।

সরকারি স্কুলসমূহে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হয় এবং নিজেদের ধর্মের বিষয়ে শিশুদেরকে শিক্ষা দিবার অধিকার পিতামাতার আছে। তবে অনেকে দাবি করেছে যে, সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা এইসব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য নন এবং ঐ বিষয়ে শিক্ষা দেবার যথেষ্ট যোগ্যতাও তাদের নেই। যদিও স্কুল থেকে দূরে ধর্মীয় শিক্ষার ক্লাসে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে শিশুদের জন্য সবসময় যানবাহনের ব্যবস্থা থাকে না, তবে বাস্তবে দেখা গেছে অতি অল্প সংখ্যক সংখ্যালঘু আছে এমন স্কুলের সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা স্থানীয় মন্দির বা গির্জার সাথে একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় ক্লাসগুলো স্কুল সময়ের বাইরে হয়ে থাকে। এদেশে কমপক্ষে ২৫ হাজার মাদরাসা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, কিছু কিছু মাদরাসা চলে সরকারি অর্থায়নে এবং কিছু কিছু চলে ব্যক্তিগত অর্থায়নে। সরকারি পরিচালনায় কোন খ্রিস্টান, বৌদ্ধ বা হিন্দু স্কুল আছে বলে জানা নেই।

**ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর বিধি-নিষেধঃ**

বাংলাদেশের সংবিধানে যে কোন ধর্ম গ্রহণ, পালন বা প্রচারের অধিকার রয়েছে, তবে ধর্মান্তরিতকরণ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বিদেশী ধর্মীয় মিশনারিদের এখানে কাজ করার অনুমতি আছে, তবে অন্যান্য বিদেশী অধিবাসীদের মতই তাদের ভিসা প্রদান ও নবায়নের ক্ষেত্রে প্রায়শই বেশ কয়েক মাস বিলম্ব করা হয়। অতীতে বেশ কিছু মিশনারি, যাদের ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত করার সন্দেহ করা হয়েছিল, এক বছরের ধর্মীয় কর্মী ভিসার নবায়ন পেতে ব্যর্থ হয়েছে। কিছু কিছু বিদেশী মিশনারি জানিয়েছেন যে, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনী ও অন্যান্যরা তাদের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে।

২০০৪ সালের আহমদিয়া প্রকাশনার বিষয়ে সরকারি নিষেধাজ্ঞার ওপর আদালতের নির্দেশনা সরকার এখনও বিরোধিতা করে চলেছে। সরকার কারণ দেখাচ্ছে যে নিষেধাজ্ঞাটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি, ফলে এই বিষয়টি বিচারিক যাচাই-বাছাইয়ের বাইরে। উচ্চ আদালত এই নিষেধাজ্ঞাকে স্থগিত করেছে, ফলে আদালতের রায় না হওয়া পর্যন্ত এটাকে কার্যকর করা যাবে না। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া পুলিশ উচ্চ আদালতের আদেশকে মান্য করেছে।

ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোন আর্থিক শাস্তির বিধান করা হয়নি; তবে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধির পদসহ সরকারি ও সামরিক চাকুরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের তুলনামূলক কম সুবিধা রয়েছে। যদিও সরকার কিছু হিন্দুকে উপ-সচিব, যুগ্ম-সচিব ও সচিব পদের মত জ্যেষ্ঠ বেসামরিক পদে নিয়োগ দান করেছে, কিন্তু ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিশেষ করে উচ্চ পদে কম প্রতিনিধিত্ব আছে। উল্লেখযোগ্য একটি ব্যতিক্রম হল বাংলাদেশ ব্যাংক- যেখানে উচ্চ পদে প্রায় ১০% অ-মুসলিমদেরকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সরকারি চাকুরির জন্য গঠিত নির্বাচনী বোর্ডে প্রায়ই সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব থাকে না। নিয়োগ প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে তাদের ধর্মের নাম প্রকাশ করার কথা বলা হয় না; কিন্তু কোন ব্যক্তির নাম দেখেই তা সহজেই নির্ধারণ করা যায়।

বর্তমানে অকার্যকর 'অর্পিত সম্পত্তি আইনের' অধীনে অনেক হিন্দু বৈষম্যের কারণে তাদের ভূ-সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেননি। উক্ত আইন ছিল পূর্ব পাকিস্তান যুগের আইন- যা সরকারকে শত্রুদের (বাস্তবে হিন্দুদের) জমি অধিগ্রহণ করার অনুমোদন দিয়েছিল। সরকার প্রায় ২৫ লক্ষ একর হিন্দু সম্পত্তি জব্দ করেছিল- যার কারণে প্রায় ১ কোটি হিন্দু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন সংসদ কর্তৃক পাশ করা হয়- যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অর্পিত সম্পত্তি আইনের আওতায় জব্দকৃত সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা সম্পত্তি মূল মালিক বা তাদের উত্তরাধিকারীদেরকে ফেরত দেয়া হবে- যদি তারা বা তাদের উত্তরাধিকারীরা বাংলাদেশে বসবাসরত নাগরিক হন। ২০০১ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে সরকার কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তির একটি তালিকা প্রস্তুত করার কথা ছিল এবং এই তালিকা প্রকাশের নব্বই দিনের মধ্যে মালিকানা দাবি পেশ করার কথা ছিল। ২০০২ সালে সংসদ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের সংশোধনী আইন পাশ করে- যেখানে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ, নিয়ন্ত্রণ ও ইজারা দেবার বিষয়ে স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদেরকে সরকার কর্তৃক সীমাহীন সময় প্রদান করা হয়েছে। এই রিপোর্ট প্রস্তুতকালীন সময়ে সরকার এই ধরনের সম্পত্তির কোন তালিকা প্রস্তুত করেনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষা অনুসারে ২০০১ সাল থেকে অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল করা সত্ত্বেও প্রায় ২,০০,০০০ হিন্দু পরিবার প্রায় ৪০,৬৬৭ একর জমি হারিয়েছে।

বিবাহ সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট পক্ষের ধর্মীয় পারিবারিক আইন অনুসারে পরিচালিত হয়েছে। তবে বিবাহগুলো রাষ্ট্রের সাথে নিবন্ধিতও হয়েছে। মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে মহিলারা পুরুষ আত্মীয়দের তুলনায় কম সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে এবং স্ত্রীদের স্বামীদের চেয়ে তালাকের ক্ষেত্রে কম অধিকার রয়েছে। যদিও মুসলমান পুরুষরা চারটা পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু সমাজ বহুবিবাহকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করে এবং এমন ঘটনা সাধারণত বিরল। ইচ্ছামাফিক তালাক এবং স্বামী কর্তৃক প্রথম স্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের ক্ষেত্রে আইন স্ত্রীলোকদের কিছুটা সুরক্ষা প্রদান করেছে। তবে এই ধরনের সুরক্ষা শুধুমাত্র নিবন্ধনকৃত বিবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গ্রাম অঞ্চলে এ

আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে কখনও কখনও বিবাহ নিবন্ধন করা হয় না। আইন অনুসারে একজন মুসলমান স্বামীকে তার পূর্বতন স্ত্রীর তিন মাস খোরপোষ দিতে হয়, কিন্তু এই আইন সবসময় বলবৎ করা হয় না। বিষয়টি বলবৎ করার ক্ষেত্রে সামাজিক চাপ খুবই কম এবং আদালতে এতই অনিষ্পন্ন মামলার চাপ থাকে যে, আদালতের মাধ্যমে এ বিষয়ে প্রতিকার পাওয়া অসম্ভব না হলেও- অত্যন্ত কঠিন। মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিস্টানদের জন্য আলাদা আলাদা পারিবারিক আইন রয়েছে- যা কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় প্রথার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বড় ধরনের পার্থক্য হল হিন্দু ধর্মে সীমাহীন বহু বিবাহের বিধান রয়েছে এবং তালাক বা বিচ্ছেদ সংক্রান্ত কোন বিধান নেই, যা হিন্দু ধর্ম অনুসারে নিষিদ্ধ।

## ধর্মীয় স্বাধীনতার অপব্যবহার

এই রিপোর্ট প্রস্তুতকালীন সময়ে নারীবাদী লেখক তসলিমা নাসরিন বিদেশে অবস্থান করছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে দেশের মুসলিম জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হানার অভিযোগে ফৌজদারি মামলা ঝুলে রয়েছে। ২০০২ সালের অক্টোবর মাসে আদালত ১৯৯৯ সালে জামায়াতে ইসলামীর একজন নেতার দায়ের করা মামলার ভিত্তিতে 'ইসলাম সম্পর্কে অবমাননাকর উক্তি' করার জন্য তাসলিমা নাসরিনকে তার অনুপস্থিতিতে এক বছর কারাদণ্ড প্রদান করেছে। তার বই আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হলেও, রাস্তায় হকাররা প্রকাশ্যে বিক্রি করছে।

২০০৫ সালের জুন মাসে সরকারি একটা প্রকল্পের জায়গা করার জন্য সরকার ৬৫টি পরিবারের ঘর-বাড়ি মাটির সাথে গুঁড়িয়ে দেয়। পত্রিকার খবর অনুসারে এই ৬৫ টি পরিবারের মধ্যে ১৫টি পরিবার ছিল সাওতাল খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের এবং ৫০ টি পরিবার ছিল হিন্দুদের। পরিবারগুলোকে তাদের সম্পত্তির ওপর বসবাসের অনুমতি দেয়া হলেও সরকার তাদের গৃহ পুনঃনির্মাণের জন্য কোন সহায়তা প্রদান করেনি। খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদেরকে আর্থিক সাহায্যের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল।

ধর্মীয় কয়েদী বা আটক ব্যক্তির কোন খবর পাওয়া যায়নি।

## বল প্রয়োগপূর্বক ধর্মান্তর

বল প্রয়োগপূর্বক ধর্মান্তরিত করার কোন খবর পাওয়া যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের নাবালক নাগরিকদের অপহরণ করা হয়েছিল অথবা বেআইনিভাবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে যাদেরকে অপসারণ করা হয়েছিল; অথবা যাদেরকে ফেরত দেওয়ার বিষয়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছিল- তাদেরকেও ধর্মান্তরিত করার বিষয়ে বল প্রয়োগ করা হয়নি।

## সন্ত্রাসী সংগঠন কর্তৃক নির্যাতন:

২০০৭ সালের ১ মে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের রেল স্টেশনে প্রায় একযোগে তিনটি ছোট বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। এতে কারও মৃত্যু হয়নি, তবে একজন আহত হয়। পুলিশ দু'টি বিস্ফোরণ স্থান থেকে আহমদিয়া সম্প্রদায় বিরোধী লেখা উদ্ধার করেছে; এর সাথে ১০ দিনের মধ্যে বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রম বন্ধেরও দাবি ছিল। সরকার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসহ আহমদিয়াদের প্রতিষ্ঠানসমূহ ও

এনজিওগুলোতে নিরাপত্তা বাড়ানোর আদেশ দেয়। যদিও আল কায়দার অঙ্গসংগঠন বলে দাবি করে একটি অপরিচিত উপগোষ্ঠী এই হামলার দায়িত্ব স্বীকার করেছে; সরকারের প্রাথমিক তদন্ত অনুসারে কোন ছোট প্রান্তিক দল এই কাজ করে থাকতে পারে জানা গেছে।

২০০৭ সালের মার্চ মাসে সরকার জামাতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) নামক নিষিদ্ধ চরমপন্থী দলের ৬ জন শীর্ষ নেতার ফাঁসি কার্যকর করে। ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে ঝালকাঠির দুইজন বিচারক হত্যাসহ ২০০৫ সালের ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণ ও আত্মঘাতী হামলার অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। মৃত বিচারকদের মধ্যে একজন ছিলেন হিন্দু, যদিও ধর্মের কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে এমন বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। ঝালকাঠি হত্যাকাণ্ডের সরকার পক্ষের স্থানীয় উকিল নিজেই হত্যার শিকার হন ১১ এপ্রিল, আপাতদৃষ্টিতে জেএমবি নেতাদের ফাঁসির প্রতিশোধ হিসেবেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়।

২০০৪ সালে শাহজালাল (রহ.) এর মাজারে বোমা বিস্ফোরণে ব্রিটিশ হাইকমিশনার আহত হওয়া সংক্রান্ত মামলার তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিলেট অঞ্চলে মুসলমানদের মাজারে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণ হয়।

## ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে অগ্রগতি ও ইতিবাচক উন্নয়ন

সরকার আহমদিয়া প্রকাশনা নিষিদ্ধ করার বিষয়টি কার্যকর করেনি। এছাড়াও প্রতিবাদকারীরা যাতে আহমদিয়া মসজিদগুলোর বাইরে 'মসজিদ নয়' ঘোষণা সংবলিত সাইনবোর্ড না ঝুলায় সে ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং আহমদিয়াদের জীবন ও সম্পত্তির ওপর হুমকি বন্ধ করা হয়। মার্চ মাসে পুলিশ স্থানীয় আহমদিয়া সম্প্রদায়েকে সুরক্ষার ব্যবস্থা নেয় যখন তারা খুলনার একটি মসজিদ থেকে আহমদিয়া বিরোধী একটি সাইনবোর্ড অপসারণ করেছিল; পুলিশ প্রথম বারের মত এ ধরনের সহায়তা দান করে।

সরকার আন্তঃধর্ম সমঝোতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ছুটির পূর্বে সরকারি নেতারা শান্তি কামনা করে বিবৃতি ইস্যু করেছে এবং বিবৃতিতে এই মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনে কেউ বাধা দানের চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রকাশ্য বিবৃতির মাধ্যমে সরকার হিন্দু ও খ্রিস্টানদের ধর্মীয় উৎসব, যেমন- দুর্গাপূজা, বড়দিন ও ইস্টার- এর শান্তিপূর্ণ উদ্‌যাপনে সহায়তা করেছে।

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও সমঝোতা বাড়ানোর ম্যান্ডেট নিয়ে ২০০৫ সালে সৃষ্ট সংগঠন 'কাউন্সিল ফর ইন্টারফেইথ হারমনি-বাংলাদেশ'-কে সরকার সহায়তা করেছে। শরিয়া আইন বাস্তবায়ন প্রত্যাশী ইসলামি চরমপন্থী গোষ্ঠী কর্তৃক ২০০৫ সালের বোমা বিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে উক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই সংগঠন ধর্মীয় ব্যাপারে পারস্পরিক সংলাপ এবং মতবিনিময় আলোচনায় সহায়তা করেছিল- যার কতিপয় অনুষ্ঠান স্থানীয় প্রচার মাধ্যমেও স্থান পেয়েছিল।

## অনুচ্ছেদ-৩: সামাজিক নির্যাতন ও বৈষম্য

প্রতিবেদনে বিবেচনাধীন সময়ে ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে সামাজিক নির্যাতন ও বৈষম্যের খবর পাওয়া গেছে। বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হয়েছে। সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংসতা ঘটেছে এবং এতে তাদের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে; তবে এসবের উদ্দেশ্য ধর্মীয় বিদ্বেষ, অপরাধমূলক নাকি সম্পত্তি বিরোধ তা পরিষ্কার ছিল না। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা এ সময়ে নাজুক ছিল কারণ রাজনৈতিক এলিটদের ওপর তাদের প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। অনেক নাগরিকদের মত তারাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্নীতিপ্রবণ ও অকার্যকর ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার শরণাপন্ন হতে অনাগ্রহী ছিল। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুলিশ অকার্যকর ছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সাহায্যের বিষয়ে তাদের পদক্ষেপ ধীরগতির ছিল। এতে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংস কাজ করার ক্ষেত্রে এক ধরনের দায়মুক্ততার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। তবে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক একে অপরের উৎসব ও অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে, যেমন- বিবাহ-শাদিতে। সুন্নিদের কাছ থেকে কোনরূপ বাধা ছাড়াই শিয়া মুসলমানরা তাদের ধর্ম বিশ্বাস পালন করেছে।

বেসরকারি খাতে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব কম ছিল না। কিছু হিন্দু জানিয়েছেন যে, মুসলমানরা ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক ও হিসাবরক্ষক পদে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে হিন্দুদেরকে প্রাধান্য দিয়েছে।

২০০১ সাল থেকে সরকার নিয়মিতভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকদেরকে নিয়োজিত করেছে; কারণ ধর্মীয় সমাবেশগুলো অনেক বড় হয় এবং এর ফলে সহিংস কার্যকলাপের সহজ ও আকর্ষণীয় লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়। খবরে প্রকাশিত সহিংস ঘটনাগুলোর মধ্যে ছিল- হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, প্রার্থনার স্থানগুলোতে হামলা, বাড়ি-ঘর ধ্বংস, জোরপূর্বক উচ্ছেদ এবং আরাধ্য বস্তুর পবিত্রতা নাশ ইত্যাদি। প্রতিবেদনে বিবেচনাধীন সময়ে উল্লিখিত ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। তবে এই ধরনের অনেক খবর স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিজেদের মধ্যেও পবিত্র দিনগুলোতে অনেক সহিংস ঘটনা ঘটেছে, কারণ কোন কোন কাজকে তারা ইসলাম বিরোধী বলে ধারণা করেছে। সরকার কোন কোন সময় এ ধরনের অপরাধ তদন্তে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা করতে ব্যর্থ হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব অপরাধীরা হল স্থানীয় মাস্তানদের নেতা।

সমাজপতিদের দ্বারা হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণের ঘটনা ঘটে চলেছে। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের তথ্য অনুযায়ী ২০০৬ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে সর্বমোট ৮৬ টি হত্যা, উপাসনালয়ের ওপর ১৭৪ টি হামলা এবং ৮০ টি হামলা, ধর্ষণ, চুরি, লুট বা ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা ঘটেছে।

মানবাধিকার সংস্থার তথ্যানুসারে, ঢাকার মিরপুর এলাকার সেনানিবাস সংলগ্ন এলাকা থেকে সেনাবাহিনী ১২০ টি পরিবারকে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে- যাদের মধ্যে ৮৫ ভাগই হল হিন্দু। এই সম্পত্তির মধ্যে একটা মন্দিরও ছিল। ১৯৬১ সালের ভূমি ক্রয় চুক্তির ভিত্তিতে সেনাবাহিনী এই উচ্ছেদ চালায়। জমির মালিকরা তাদের জমি অধিগ্রহণ ও উচ্ছেদ বিষয়ে আদালতে মামলা করেছে এবং সে মামলা এখনও নিষ্পত্তি হয়নি।

সংবাদপত্রের খবর অনুসারে ২০০৭ সালের ২৬ শে জুন একদল মুসলমান গ্রামবাসী দুর্বাছড়ি গ্রামে কিছু নতুন ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদের ওপর আক্রমণ চালায়। জুন মাসের ১২ তারিখে কয়েক ডজন হিন্দু ও

মুসলমান খ্রিস্টান ধর্মে দিক্ষিত হয়। অভিযোগ আছে যে, ২৬ জুনের ঘটনায় একদল মুসলমান নবদিক্ষিত খ্রিস্টানদের ওপর আক্রমণ চালায় এবং গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার জন্য ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেয়। লাঠির আঘাতে দুই থেকে তিনজন খ্রিস্টান আহত হয়। সহিংস ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য এবং নবদিক্ষিত খ্রিস্টানরা যেন তাদের বাড়িতে থাকতে পারে ও তাদের জমিতে কাজ করতে পারে- সেজন্য পুলিশ দুর্বাছড়ি গ্রামে একটি বিশেষ ক্যাম্প স্থাপন করে। পুলিশ অফিসাররাও এই গ্রামে তাদের টহল বৃদ্ধি করে এবং এই প্রতিবেদনে বিবেচনাধীন সময়ের শেষ দিকে জেলা পুলিশ সুপার এই এলাকার উত্তেজনা প্রশমনের জন্য পদক্ষেপ নেয়।

২০০৭ সালের ২৮ এপ্রিল জনৈক তাহের মিয়া শিবনগর গ্রামের ১০ বছরের একটি হিন্দু শিশুকে ধর্ষণ করে। শিশুটির পরিবার পুলিশের কাছে অভিযোগ দেয় এবং তাহেরকে গ্রেফতার করা হয়।

২০০৭ সালের ১৯ এপ্রিল আমতলী উপজেলার তক্তাবুনিয়া গ্রামের একটি হিন্দু মেয়েকে গণ-ধর্ষণের দায়ে পুলিশ আব্দুল মালেককে গ্রেফতার করে। জানা যায়, মেয়েটি অপরাধী ব্যক্তির সাথে গ্রাম ত্যাগ করেছিল- যে তাকে একটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এই অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত তিনজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে পুলিশ খুঁজছে।

২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে মৌলভীবাজারের ক্যাথলিক খাসিয়া সম্প্রদায়ের নেতারা স্থানীয় বন বিভাগের কর্মকর্তাদের দ্বারা হয়রানির বিষয়ে স্থানীয় সরকারের কাছে অভিযোগ দাখিল করেন। বন বিভাগের কর্মকর্তারা সেখানে মনছড়া বন দেখাশুনা করে, যেখানে অনেক খাসিয়া বসবাস করেন। তারা অভিযোগ করেছে যে, বন বিভাগের কর্মকর্তারা ভীতি প্রদর্শনের জন্য তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে- এমনকি স্থানীয় ক্যাথলিক মিশনের প্রধানের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

প্রতিবেদনে বিবেচনাধীন সময়ে বন বিভাগের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দেশের অন্যান্য স্থানেও সংখ্যালঘু লোকদেরকে হয়রানি করার অভিযোগ রয়েছে। ২০০৭ সালের ১৮ মার্চ সেনা সদস্যরা চলেশ রিছিল নামক একজন খ্রিস্টান গারো ও তার আত্মীয়কে মধুপুর থেকে গ্রেফতার করে। মানবাধিকার সংস্থার তথ্য অনুসারে স্থানীয় সেনা ক্যাম্পে রিছিলকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। তার আত্মীয়কে নির্যাতনের পর ছেড়ে দেয়া হয়। রিছিল ও স্থানীয় অন্যান্য গারোরা বন বিভাগের সাথে আইনী লড়াইয়ে সম্পৃক্ত ছিল। বন বিভাগ মধুপুর বন দেখাশুনা করে, যেখানে বহু গারো বসবাস করেন ও কাজ করেন। সেনাবাহিনী রিছিলকে নির্যাতন করার কথা অস্বীকার করে এবং দাবি করে যে, রিছিল নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বনের মধ্যে পালানোর সময় গাছের সাথে ধাক্কা লেগে মারা যান।

সরকার কয়েকজন উচ্চপদস্থ বন কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করে এবং তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনে। এসব গ্রেফতারের পর বনে বসবাসকারী আদিবাসী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নতুনভাবে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি এবং তাদের ওপর উৎপীড়ন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর ২৭ বছর বয়সী মুসলমান যুবক বশির আহমেদ চট্টগ্রামের ১২ বছর বয়সী হিন্দু মেয়ে মেরি দাসকে অপহরণ করে এবং তাকে ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত করার পর বিবাহ করে। মেয়েটির বাবা ফৌজদারি মামলা দায়ের করার পরেও পুলিশ মেয়েটিকে উদ্ধার করতে বা বশির আহমেদকে গ্রেফতার করতে পারেনি। মানবাধিকার অনুসন্ধানকারীরা জানিয়েছেন যে, বশির আহমেদ

মেরি দাসকে তার স্কুলে যাবার পথে নিয়মিত উত্যক্ত করত এবং অপহরণের দিন তার সাথে যাবার জন্য প্রলোভিত করেছে। পুলিশ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইনের আওতায় বশির আহমেদ ও তার আত্মীয়দের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। বাংলাদেশের আইনে ১৮ বছরের নিচে বিবাহ নিষিদ্ধ।

প্রতিবেদনে বিবেচনাধীন সময়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উৎপীড়ন ও সহিংসতার খবর পাওয়া গেছে।

মানবাধিকার গোষ্ঠী ও খবরের কাগজের সংবাদ থেকে জানা যায় যে, গ্রাম অঞ্চলে নৈতিক স্খলনের দায়ে অভিযুক্ত নারীদের বিরুদ্ধে ফতোয়ার আওতায় খবরদারি করার ঘটনা ঘটেছে এবং চাবুকমারার মত শাস্তিও দেয়া হয়েছে। ২০০৬ সালে ধর্মীয় নেতারা ৩৯টি ফতোয়া জারি করেন- যেখানে পরিবার ও সম্প্রদায়ের সদস্যগণ কর্তৃক বেত্রাঘাত ও অন্যান্য দৈহিক নির্যাতন থেকে শুরু করে পরিত্যক্ত করার মত শাস্তির দাবি করা হয়েছে।

ঢাকা ও কিছু অন্যান্য স্থানে প্রায় এক লাখ আহমদিয়া কেন্দ্রীভূত অবস্থায় আছে। মূলধারার মুসলমানরা আহমদিয়া শিক্ষাকে বর্জন করেছে, কিন্তু ভয়ভীতি ও নির্যাতন ছাড়া আহমদিয়া ধর্মকে পালন করার অধিকার প্রদানের বিষয়টি অধিকাংশ লোক সমর্থন করে। তবে যারা আহমদিয়া শিক্ষার বিরোধিতা করে তাদের দ্বারা আহমোদিয়ারা এখনও উৎপীড়িত ও নির্যাতিত হয়ে আসছে।

২০০৪ সাল থেকে আহমদিয়া বিরোধী চরমপন্থীরা যথা, আন্তর্জাতিক খতমে নবুওয়াত আন্দোলন বাংলাদেশ এবং খতমে নবুওয়াত আন্দোলন বাংলাদেশ নামক একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী সরকারের নিকট প্রকাশ্যে দাবি করেছে যে, আহমদিয়াদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করে আইন পাশ করতে হবে। সরকার এই চরমপত্র অগ্রাহ্য করেছে এবং প্রতিবাদকারীদের থেকে আহমদিয়া স্থাপনাগুলোকে নিরাপদ রেখেছে। গণ-মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোশাররফ হোসেন শাহজাহান বলেছিলেন, "কোন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু এই মতপার্থক্যের দরুন কেউ অন্যের ওপর আক্রমণ করতে পারে না।" আহমদিয়া সম্প্রদায় তাদের উদ্বেগের বিষয়ে সরকারের সাড়াদানের জন্য এবং প্রতিবাদকারীদেরকে কৌশলগতভাবে মোকাবিলা করার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে।

১ মে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে যে তিনটি ছোট বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল- তাতে চট্টগ্রামে একজন আহত হয়। দু'টি বিস্ফোরণ স্থানে যে চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল তাতে আহমদিয়া ও এনজিওদের ভীতি প্রদর্শনের বার্তা ছিল। পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে সারা দেশের আহমদিয়া স্থাপনায় নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে।

২০০৭ সালের ২০ ও ২১ মার্চ পঞ্চগড়ে আহমদিয়াদের যে অঞ্চলিক সমাবেশ হওয়ার কথা ছিল তা নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে স্থানীয় কর্মকর্তারা বাতিল করতে বাধ্য করে। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আহমদিয়া কবরস্থান থেকে পুলিশ ১১টি অবিস্ফোরিত বোমা উদ্ধার করে।

২০০৭ সালে মার্চের প্রথমদিকে পুলিশ আহমদিয়া নেতাদেরকে খুলনার একটা মসজিদ থেকে আহমদিয়া বিরোধী সাইনবোর্ড অপসারণে সাহায্য করেছিল। সাইন বোর্ডে লেখা ছিল- এই এই ভবনটি কোন মসজিদ নয় এবং আহমদিয়ারা অমুসলমান। পুলিশ কর্তৃক এ ধরনের সাইনবোর্ড অপসারণের ঘটনা এটাই প্রথম।

২০০৬ সালের জুন মাসে খতমে নবুওয়াত আন্দোলন বাংলাদেশ আবারও আহমদিয়াদেরকে অমুসলমান ঘোষণার জন্য সরকারের কাছে দাবি পেশ করে এবং ২৩ শে জুন, ২০০৬ তারিখে প্রায় ১৫০০ থেকে ২০০০ প্রতিবাদকারী ঢাকার কাছে একটি আহমদিয়া মসজিদ অবরোধ করার চেষ্টা চালায়। এর প্রেক্ষিতে সহিংসতা রোধের জন্য পুলিশ বিভাগ তাৎক্ষণিকভাবে তিন হাজার পুলিশ মোতায়েন করে এবং প্রতিবাদকারীদেরকে আহমদিয়া কমপ্লেক্সে পৌঁছানো থেকে বাধা দান করে। এরপর খতমে নবুওয়াতের সমর্থকরা ঢাকার জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সড়কে প্রবেশ বন্ধ করার চেষ্টা চালায়, কিন্তু পুলিশ সে চেষ্টা নস্যাৎ করে দেয়। এর ফলে  খতমে নবুওয়তের ১০ থেকে ২০ জন সমর্থক আহত হয়। মসজিদ অবরোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় খতমে নবুওয়াত সকাল সন্ধ্যা হরতাল ডাকে এবং হযরত মুহাম্মদ (স.)কে শেষ নবী হিসেবে ঘোষণা করে আইন পাশ করার জন্য আবারও দাবি পেশ করে। তবে হরতালের হুমকি কখনই বাস্তবায়িত হয়নি। পরবর্তীতে ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকার আরও একটি আহমদিয়া মসজিদ অবরোধ করতে গেলে খতমে নবুওতের প্রতিবাদকারীরা ঐ স্থাপনায় পৌঁছানোর আগেই প্রচেষ্টা পুলিশ ব্যর্থ করে দেয়।

## অনুচ্ছেদ- ৪: যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নীতি

যুক্তরাষ্ট্র সরকার ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি সরকারের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং ধর্মীয় ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে থাকে। প্রতিবেদনে বিবেচনাধীন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস ২০০৭ সালের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন যেন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এর লক্ষ্য ছিল ২০০১ সালে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা যে সহিংস ঘটনার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল তা দূর করা। যখন নির্বাচন মুলতবি হয়ে গেল এবং জরুরি অবস্থা জারি করা হল তখন যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস উপজাতীয় সংখ্যালঘু ও অন্যান্য সম্প্রদায় ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ মানবাধিকার এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। দূতাবাসের কর্মকর্তারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে মানবাধিকার পরিস্থিতি অনুসন্ধান করেন এবং সুশীল সমাজের সদস্য, এনজিও ও স্থানীয় ধর্মীয় নেতা এবং অন্যান্য নাগরিকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং পরবর্তী নির্বাচনের সহিংসতার বিষয়ে তাদের উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা করেন। তারা সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইনপ্রয়োগকে উৎসাহিত করেন।

দূতাবাস ও সফরকারী যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কর্মকর্তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উদ্বেগ শোনার জন্য ও যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের বিষয়টি তাদের জানানোর জন্য নিয়মিত উক্ত সম্প্রদায়গুলোর সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

দূতাবাস যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মভিত্তিক ত্রাণ সংস্থাগুলোকে সহায়তা প্রদান করেছে যাতে তারা সরকারি চ্যানেলের মাধ্যমে স্কুল ও অন্যান্য প্রকল্পের অনুমোদনের জন্য কাগজপত্র তৈরি করতে পারে। বাংলাদেশ সরকার এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী এবং সাধারণভাবে সমস্যা সমাধানে সহায়ক। যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস এদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এসব সংস্থার পক্ষে কাজ করেছে- যাতে তাদের ভিসা সমস্যার সমাধান হয়।

ইমাম প্রশিক্ষণ সূচি প্রণয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারকে উৎসাহিত করেছে। প্রাথমিক পাইলট প্রকল্পের পর যুক্তরাষ্ট্র সরকার ইমামদের জন্য

মানবাধিকার ও লিঙ্গ সমতার বিষয়ে প্রশিক্ষণ ক্রম কি হবে তা সরবরাহ করেছে। দ্বিতীয় বছরের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রখ্যাত মুসলমান আলেমকে এদেশে ভ্রমণের ব্যবস্থা করে এবং বাংলাদেশী শ্রোতাদের সাথে কথা বলার ব্যবস্থা করে। তিনি দেশের উত্তর পশ্চিম শহর রাজশাহী সফর করেন এবং ঢাকাতেও বেশ কয়েকটা দলের সম্মুখে পবিত্র কোরআনের যেসব আয়াত সহিষ্ণুতা ও নারী-পুরুষ ন্যায্যতার বিষয়গুলো সমর্থন করে সেগুলোর ব্যাখ্যা তুলে ধরেন।

প্রতিবেদনে বিবেচনাধীন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সবসময় বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তাদের সাথে অনুষ্ঠিত সভার আলোচ্য বিষয় হিসেবে ধর্মীয় স্বাধীনতা -বিশেষ করে আহমদিয়া সম্প্রদায় যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সে বিষয়টি উত্থাপন অব্যাহত রাখে। আহমদিয়া সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন প্রদর্শন করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের কর্মকর্তরা আহমদিয়া সদর দফতর পরিদর্শন অব্যাহত রেখেছিলেন।

একজন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সদস্যের ওপর হামলার প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস জামায়াতে ইসলামীকে উৎসাহিত করেছিল যাতে তারা প্রকাশ্যে বলে যে, তারা সহিষ্ণুতা ও সংখ্যালঘুদের অধিকার সমর্থন করে। যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত গণতন্ত্র ও শাসন প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে সহিষ্ণুতা ও সংখ্যালঘুদের অধিকারের বিষয়।

*১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে প্রকাশিত।*

---